

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী
পরীক্ষার চাপে
স্কুলে শিক্ষা
অধিদফতর

৩০ লাখের ভার

বিভাষ বাউ। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৩০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর পরীক্ষার চাপ সামলাতে পারছে না প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এসএসসি ও এইচএসসিতে যেখানে ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার জন্য বোর্ড আছে ১০টি, সেখানে প্রাথমিকের ৩০ লাখের জন্য বোর্ড নেই একটিও। ২০০৯ সাল থেকে দেশের বৃহত্তর এ পাবলিক পরীক্ষা শুরুর পর থেকেই পৃথক বোর্ডের দাবি উঠলেও তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় নিয়মিত কাজ বন্ধ রেখে পরীক্ষার তদারকি করছে অধিদফতর। তবে এবার শিক্ষার মান বাড়াতে প্রাথমিক ও

গণশিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ

অধিদফতরের ১৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পরীক্ষার সময় বিজি প্রেসসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তখন আমাদের প্রধান অফিস বন্ধ হয়ে

কমিটি বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনাও হয়েছে। তবে স্থায়ী কমিটির রেজলেশন হাতে পাওয়ার পর আমরা বোর্ডের একটি কাঠামো করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব আকারে জমা দেব। এরপর বোর্ডের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। জানা গেছে, ৩০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর পরীক্ষার জন্য কোন বোর্ড না থাকা শিক্ষার মানের জন্য সুখকর নয় বলে দ্রুত বিষয়টিতে নজর দেয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্যরা। (২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

● এসএসসি, এইচএসসির ১৫ লাখের জন্য বোর্ড আছে দশটি ● প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য কোন বোর্ড নেই

আলমগীর বলছিলেন, পরীক্ষার জন্য অবশ্যই একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড থাকা উচিত। এই পরীক্ষা নিতে গিয়ে আমরা প্রচণ্ড চাপে রয়েছি।

যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। হাজার হাজার কাজের মধ্যে পরীক্ষা নেয়াটা খুব কষ্টকর। এজন্যই হয়ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী

৩০ লাখের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইতোমধ্যেই শিক্ষার মান বাড়াতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে গতি না থাকায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না বলেও সংসদীয় কমিটি মত দিয়েছে। কমিটি শিক্ষার মান বাড়াতে মন্ত্রণালয়কে তাদের কাজে গতিশীলতা আনারও সুপারিশ করেছে। কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন বলেন, সংসদীয় কমিটি শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন এবং শিক্ষাক্রম তৈরির সুপারিশ করেছে। এই শিক্ষাক্রমের বই ছাপার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও, তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ায় কমিটি অসন্তোষ প্রকাশ করে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বিনা মূল্যে হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও এর কোন লক্ষণ নেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা, এসএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষা থাকবে না। কমিটির সদস্যরা বলছেন, একটি অধিদফতর দেশের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নিচ্ছে। পরীক্ষা নেয়া তো কোন অধিদফতরের কাজ নয়। এটা

বোর্ডের কাজ। তাই সংসদীয় কমিটি মনে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিকের জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড হতে হবে।

প্রতিবছর এসএসসিতে প্রায় ১৫ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এ পরীক্ষা সারা দেশের আটটি সাধারণ বোর্ডসহ ১০ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। সেই হিসেবে গড়ে প্রতি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকে এক লাখ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী। বোর্ডগুলোকে এই পরীক্ষা নিতেই হিমশিম খেতে হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও খাতা মূল্যায়ন নিয়ে বারবারই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে বোর্ডগুলোকে। অথচ দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করেছে প্রায় ৩০ লাখ পরীক্ষার্থী। এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য এতদিনেও গঠিত হয়নি একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক পরিচালক দ্রুত সংসদীয় কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি তুলে বলছিলেন, এত বিশাল পরীক্ষার্থীর বোঝা অধিদফতর কোনভাবেই সামলাতে পারছে না। একটি পরীক্ষার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে পুরো বছর। পরীক্ষার সময় প্রধান অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। এত নিয়মিত কাজের মধ্যে পরীক্ষা নেয়াটা রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ওই কর্মকর্তারা বলেন, ২০১৩ সালে ২৬ হাজার স্কুল জাতীয়করণ হওয়ায় এখন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২ হাজারের উপরে। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চার লাখ। প্রতিষ্ঠান বাড়লেও অধিদফতরের লোকবল আছে আগের মতোই। স্কুল ও শিক্ষকের দেখভাল করাই একটি অধিদফতরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সময়মতো অনেক কাজই করা সম্ভব হয় না। এরপরও আবার থাকে পরীক্ষার দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড থাকলে তারা পরীক্ষার পাশাপাশি কারিকুলামসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেরও দায়িত্ব নিতে পারত। চলতি বছরেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। প্রাথমিকের পাশাপাশি জুনিয়র স্কুল

সিটিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার দায়িত্বও এসে পড়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও দক্ষতা না থাকায় শেষ পর্যন্ত তারা জেএসসি পরীক্ষা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা যখন অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে তখন আগামীতে তাদেরই এই পরীক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আর তা নেয়ার জন্য অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজন হবে বলে বলছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা প্রাথমিক সমাপনী শুরু হয় ২০০৯ সালে। ওই বছর অংশ নেয় ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৫ জন। পরের বছর থেকে শুরু হয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষাও। ২০১০ সালের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৮৮ হাজার ১৪৮ জন। ২০১১ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৫ জন। ২০১২ সালে অংশ নেয় ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ জন শিক্ষার্থী। ২০১৩ সালে অংশগ্রহণ করে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন পরীক্ষার্থী। ২০১৪ সালে অংশ নেয় ৩১ লাখ ১০ হাজার ৮৭৮ জন পরীক্ষার্থী, ২০১৫ সালে অংশ নেয় ৩২ লাখ ৫৪ হাজার ৫১৪ জন পরীক্ষার্থী। এবারও অংশ নিয়েছে ৩২ লাখ। গত সাত বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৪ লাখ।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড না থাকায় এই পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল তৈরিতে ভুল ও অনিয়মের অভিযোগও উঠছে। বর্তমানে খাতা দেবা ও ফলাফল তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে। এরপর তা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যায়। বৃত্তি প্রাপ্তির আশায় বা ভাল ফলাফলের জন্য অনেক অভিভাবকই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দারস্থ হন। টাকার বিনিময়ে এসব কর্মকর্তার অনেকের বিরুদ্ধেই জিপিএ ৫ পাইয়ে দেয়ারও অভিযোগ উঠেছে। প্রতি বছরই পরীক্ষা নিয়ে ডিপিই'তে অভিযোগ আসছে।

প্রায় প্রতিবারই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এমনকি আগের রাতে পাওয়া প্রশ্নের বেশিরভাগই মিলে যায় মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে। প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে (নেপ)। এরপর তা ছাপানো ও বিতরণসহ অন্যান্য দায়িত্ব আবার অধিদফতরের। ফলে দুই দফতরের একাধিক লোকের হাত হয়ে এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীর হাতে পৌছানোয় তা ফাঁসের ঝুঁকি বেড়ে যায়। অথচ শিক্ষা বোর্ড থাকলে তারা একাই তা করতে পারত এবং তাদের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকায় তারা যে কোন মূল্যে প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে কাজ করত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা